International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 32-37
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

শ্রীরাজমালা কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নারী জীবন

রূপশ্রী দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, ডি.ডি.ই, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

'Rajmala', the famous chronicle of Tripura dynasty, is a historical poem. This famous book contains the legends of the reign of kings of the small hilly state Tripura. The main objective of the paper is to explore the position of women in the medieval period which is portrayed in the historical poem Rajmala. In that period women did not have the right to lead a life of freedom as patriarchal society had many restrictions and limitation for the women. Women position in society was deteriorated during the medieval period. Most of the time womens were sexually exploited by the king. The pathetic picture of women of that period will be given in details in main paper.

Keywords: Tripura dynasty, Rajmala, History, Medieval period, Women.

(এক)

বাঙালি ইতিহাস বিমুখ জাতি, বাঙালির ইতিহাস নেই—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও ঐতিহাসিক তাঁদের একাধিক রচনায় এ জাতীয় আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যটি এ ব্যাপারে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার। 'ইতিহাস' সম্পর্কিত এ জাতীয় আক্ষেপোক্তি এ রাজ্যের ক্ষেত্রে সর্বাংশে প্রযোজ্য নয়। ইংরেজের হাতেই এদেশে প্রথম ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত। কিন্তু তারও বহু আগে মধ্যযুগে অর্থাৎ সুদূর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা রাজ্যের 'মাণিক্য' উপাধিধারী রাজারা ইতিহাস চর্চার শুভ সূচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা না হলেও বাংলা ভাষায় সমস্ত রাজকার্য পরিচালিত হতো। রাজাদেরই আগ্রহে এ রাজ্যের রাজসভায় বাংলা ভাষায় একসময় রাজ-ইতিহাস রচিত হয়েছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে একাধিক সভাকবি রচনা করেছিলেন শ্রীরাজমালা কাব্যের এক- একটি লহর। মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্য যেখানে কোনো না কোনো ভাবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছে, সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে কাব্যের আধারে ইতিহাস রচনার এই প্রয়াস একটি অভিনব বিষয়। মধ্যযুগের রচনাশৈলী অনুসরণে রচিত এই কাব্য কোন দৈবী-মাহাত্ম্য প্রচারে রচিত নয়, বরং রাজা ও রাজবংশের কীর্তি-কাহিনি অর্থাৎ রক্ত-মাংসের বাস্তব মানুষের কথা বলার জন্যই এ কাব্য রচনার আয়োজন করেছিলেন ত্রিপুরার রাজাবৃন্দ।

মধ্যযুগে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষাতে একাধিক কাব্য রচিত হলেও রাজপ্রশস্তিমূলক কাব্য বেশি লেখা হয়নি। অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য এবং মঙ্গলকাব্য এই তিন শাখাতে রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী শ্রীরাজমালা কাব্য। কেননা রাজবংশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজনে ত্রিপুরার রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা দেখা দিলেও কবি শুধুমাত্র ইতিহাসের সাল তারিখ ও যুদ্ধ বর্ণনার বিবরণমাত্র রচনা করেন নি। সুবৃহৎ এই গ্রন্থটিতে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন বৃহত্তর ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন- ***"রাজমালা ত্রিপুরা রাজবংশের বৃত্তান্ত হইলেও ইহার সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের তদানীন্তন সমাজ ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে।...সেই সময়ের স্থানীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই ইতিহাসকাব্যের মূল্য স্বীকার করিতে হয়।"***[১]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গদেশের নারীর অবস্থা কেমন ছিল তা জানতে গেলে একান্তভাবে নির্ভর করতে হয় ঐ সময়কার সাহিত্যের উপর। আবার ত্রিপুরার নারীদের অবস্থা তখন কেমন ছিল তা জানতে হলে শ্রীরাজমালা উল্লেখযোগ্য আকর গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারায় তথা তার বিভিন্ন শাখায় প্রতিফলিত নারী চরিত্র থেকে শ্রীরাজমালার নারী অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র। কারণ ধর্ম ও কাল্পনিকতার আবরণ মোচন করে শ্রীরাজমালায় প্রতিফলিত হয়েছে বাস্তবানুগ ঐতিহাসিক নারী জীবনের কথা। মধ্যযুগের কবিদের সমাজচেতনা ও রাষ্ট্রিকচেতনা উপযুক্ত মাত্রায় না থাকলেও এ কাব্যে রাজন্য আমলের নারী জীবনের বিবিধ দিক চিত্রিত হয়ে আছে। সুদীর্ঘ রাজ-ইতিহাস থেকে মধ্যযুগে ত্রিপুরার সমাজে ও রাজ-পরিবারে নারীর অবস্থানের চিত্র বর্তমান নিবন্ধে কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হলো।

(দুই)

প্রথমে শ্রীরাজমালা কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যাক। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালের (১৯২৩-১৯৪৭ খ্রিঃ) বিভিন্ন সময়ে কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় শ্রীরাজমালা কাব্যের লহরগুলি প্রকাশিত হয়। কাব্যটি মোট চারটি লহরে বিভক্ত। প্রথম লহর ধর্মমাণিক্যের (১৮৩১-১৪৬২ খ্রিঃ) আদেশ অনুসারে রচিত, তাতে রয়েছে দৈত্য থেকে মহামাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ। এই লহরের রচয়িতা হলেন পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয় শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর, আর বক্তা হলেন চতুর্দশ দেবতার চন্তাই (পুরোহিত) দুর্লভেন্দ্র। প্রতক্ষ্যদর্শী চন্তাই রাজপরিবারের দেব সেবার কাজ ছাড়াও রাজ বংশাবলী ও রাজত্বের ইতিহাস কণ্ঠস্থ রাখতেন। তাঁরই বক্তব্য অনুসারে রাজবংশের সুদীর্ঘ রাজকীয় কাহিনি পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর এ কাব্যের প্রথম লহরে লিপিবদ্ধ করেছেন।

প্রথম লহরের কবিদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। কারো মতে তাঁরা ত্রিপুরা জেলার লোক, আবার কারো মতে তাঁরা শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন। এ সম্পর্কে কাব্যের সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন লিখেছেন- ***"গ্রন্থের ভাষা আলোচনা করিলে বুঝা যায়, কবিদ্বয় ত্রিপুরা, নোয়াখালী, কিম্বা শ্রীহট্ট অঞ্চলের লোক ছিলেন। গ্রন্থভাগে সেই সকল জেলায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ পাওয়া যায়।"***[২] কিন্তু আত্মপরিচয় জ্ঞাপক কোনো উক্তি কবিদ্বয় লিপিবদ্ধ করে যান নি, ফলে তাঁদের আবির্ভাব কিংবা জন্মস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

মহারাজা অমর মাণিক্যের (১৫৭৭-৮৬ খ্রিঃ) আদেশে রচিত এই কাব্যের দ্বিতীয় লহরে ধর্ম মাণিক্য থেকে জয় মাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই লহরের বক্তা হিসেবে বৃদ্ধ সেনাপতি রণচতুর ণারায়নের নাম পাওয়া গেলেও এই লহরের রচয়িতা কে তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি। শ্রীরাজমালা সম্পাদক লিখেছেন- ***"রণচতুরের বর্ণনানুসারে নিশ্চয়ই কোনো সভাপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল, সেই পণ্ডিতের নামোদ্ধারে অকৃতকার্যহেতু নিতান্তই দুঃখিত আছি।"***[৩]

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের (১৬৬১-১৬৭৩ খ্রিঃ) অনুজ্ঞায় রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হয়েছিল। আবার এও বলা হয়ে থাকে যে পরবর্তী রাজা রামমাণিক্যের সময় ঐ লহর রচিত হয়। সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিধারী প্রাচীন দ্বারপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার তৃতীয় লহর রচিত হয়েছে। তবে রচয়িতার নাম কিংবা পরিচয় সূচক কোনো বিবরণ গ্রন্থে নেই। এই লহরে মহারাজ অমর মাণিক্যের রাজত্বকাল হতে কল্যাণ মাণিক্য পর্যন্ত বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামগঙ্গা মাণিক্যের আমলে (১৮১৩ - ১৮২৫ খ্রিঃ) রাজমালা কাব্যের চতুর্থ লহর রচিত হয়। এই লহরে গোবিন্দ মাণিক্য হতে কৃষ্ণ মাণিক্য পর্যন্ত নয় জন রাজার বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। বৃদ্ধ, বহুদর্শী ও জ্ঞানবান জয়দেব উজীর এই লহরের বক্তা। এই লহরের রচয়িতা তারই পুত্র দুর্গামণি উজীর। চতুর্থ লহরের বক্তা ও রচয়িতা উভয়েই রাজ দরবারে 'উজীর' পদে নিয়োজিত ছিলেন ।

প্রতিটি লহর আলোচনা করলে দেখা যায়, মহারাজ ধর্ম মাণিক্যের আদেশে রচিত প্রথম লহরে তাঁর পূর্ববর্তী রাজার রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় লহরের ক্ষেত্রেও অমর মাণিক্যের পূর্ববর্তী রাজা পর্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ লহরেও এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, যে রাজার আদেশে যে খণ্ড রচিত হয়েছে, সে খণ্ডে তাঁর বিবরণ প্রদান করা হয় নি। সুতরাং দেখা গেল, পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে শ্রীরাজমালা কাব্যের চারটি লহর রচিত হয়েছে।

(তিন)

ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে যোগদানের পূর্বে ত্রিপুরা রাজন্য শাসিত স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু এই স্বাধীন রাজ্যে তখন নারী স্বাধীনতা ছিল কি? কিংবা রাজ-পরিবারে নারীর ভূমিকা বা গুরুত্বই বা কতটুকু ছিল? শ্রীরাজমালায় রাজবন্দনা থাকলেও প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণের মধ্য থেকে উঠে আসে তৎকালীন সমাজচিত্রের ক্ষীণ রূপরেখা। আর তাতেই নারী নিগ্রহের স্বৈরাচারী ইতিহাসকে আবিষ্কার করতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীরাজমালা কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

ক) রাজ-পরিবারে নারীর অবস্থান।

খ) তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান।

ত্রিপুরার রাজ-পরিবারে নারীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, এরূপ চিত্র রাজমালায় পাওয়া যায় না। রাজ-পরিবারে রাজাই প্রধান এবং তিনি পুরুষ, সুতরাং তাঁর প্রাধান্যই যে বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে দুটি ক্ষেত্রে ত্রিপুরার রাজবংশ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন স্থাপন করেছে—

এক) রাজ-পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী রাজার নামের সাথে মিল রেখে রানির নাম রাখা হতো।

দুই) মুদ্রায় রাজার নামের পাশে রানির নাম লেখা হতো।

এই দুটি প্রথা বা নিয়ম মধ্যযুগে ভারতের আর কোনো রাজ্যে প্রচলিত ছিল না। ত্রিপুরার রাজারা এ দুটি ব্যাপারে কিছুটা উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগে যখন নারীকে মানুষ বলেও অনেক ক্ষেত্রে গণ্য করা হতো না, বরং তাঁকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হতো, সেই সময় ত্রিপুরার মতো একটি প্রত্যন্ত রাজ্যে নারীকে এই সম্মান ও সম্মতি জানানো ঐ যুগ-প্রেক্ষাপটে সত্যিই সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার।

রাজ-দরবারে রানির সম্মানকে রাজার সমপর্যায়ে তুলে ধরার লক্ষ্যেই রাজার নামের সাথে মিলিয়ে রানির নাম রাখার এই প্রচেষ্টা। প্রথাটি একসময় এই রাজবংশের অন্যতম পৌরাণিক সংস্কারে পরিণত হয়। প্রথম লহরের কবি লিখেছেন-

আচোঙ্গ রাজার নাম আচোঙ্গ মা রাণী।
তদবধি রাজা রাণী এক নাম জানি।।[৪] *(প্রথম লহর, পৃ, ৪২)*

কাব্যের তৃতীয় লহরে রয়েছে মহারাজা অমর মাণিক্য ও রানি অমরাবতীর কথা। কবি লিখেছেন-

অমরমাণিক্য রাজা বৈসে সিংহাসন।।
অমরাবতী মহাদেবী সতী পতিমতি।।[৫] *(তৃতীয় লহর, পৃ, ৩)*

অন্যদিকে ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মুদ্রাতেই রাজার নামের সঙ্গে রানির নাম লিখিত হতো। এভাবে রাজারা তাঁদের রানিদের মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজসভা কবিও রাজার স্তুতিগান করতে গিয়ে রানির মহিমা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন। এতে বোঝা যায় যে, রাজারা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলেই রাজ-দরবারে রানিরা এধরনের সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

তবে এটা একটা আংশিক বা খণ্ড চিত্র। রাজ-পরিবারের মধ্যে রানির যে অবস্থান, তাতে প্রত্যক্ষ করা যায় একমাত্র রাজার আগ্রহেই রানিরা এধরনের সম্মান লাভ করতেন। কিন্তু এছাড়া পরিবারে তাঁদের অন্য কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। রাজার নির্দেশ মতোই রানিদের চলতে হতো। রাজার নামের সাথে মিলিয়ে রানির নাম রাখা হলে রাজ-দরবারে তাঁর সম্মান হয়তো বৃদ্ধি পেতো, কিন্তু চিরকালের মতো লুপ্ত হয়ে যেত তাঁর স্বকীয়তা। যে নামের সঙ্গে তিনি এতদিন পরিচিত ছিলেন, যে নামের সঙ্গে তাঁর শৈশবের স্মৃতি জড়িত, সেই পিতৃদত্ত নাম মুহূর্তে মিলিয়ে যেত বিস্মৃতির গহ্বরে। রাজাই হচ্ছেন রাজ্যের অধীশ্বর, সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে, তাই রাজা চাইলেই শাস্তি-স্বরূপ রানিকে নির্বাসন দিতে পারতেন। রাজ-পরিমণ্ডলে রানির সম্মান ও ক্ষমতার পরিমাণ কতটুকু হবে তা পুরোটাই নির্ভর করতো রাজার ইচ্ছা-অনিচ্ছা আর মর্জির ওপর। নারী কাকে কি বলবে তাও অনেক সময় নির্ধারণ করে দিতেন রাজারা। প্রথম লহরের কবি লিখেছেন-

রাজাগণে শিখাইল কহিছিল যাহা।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে নারী করে তাহা।।[৬] *(প্রথম লহর, পৃ, ৪৭)*

রাজ-পরিবারের সকল নারীই এক অদৃশ্য কারণে রাজার কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। তাকে পালন করতে হতো রাজ-আজ্ঞা। তাঁর স্বাধীন সত্ত্বা কিংবা অভিমত কোনো গুরুত্বই পেত না বরং নারীর চিন্তা-চেতনা লুপ্ত করে দেবার সার্বিক আয়োজন ছিল। প্রয়োজন অনুসারে বস্তুর প্রয়োজন যতটুকু, নারীর প্রয়োজনও তখন সেটুকুই ছিল, ইতিহাস যার প্রমাণ রেখে গেছে। চিরকালের নিয়ম মতো এ রাজ্যেও পুরুষের (রাজাদের) ইচ্ছা অনুযায়ী নারীকে (রানিদের) নিঃশব্দে সব কিছু মেনে নিতে হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী পুরুষ খেয়াল খুশি মতো তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে নারীর উপর। প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে নারীকে। রাজকীয় আড়ম্বর ও নিষ্ঠুরতায় নারী লুণ্ঠন ও লাঞ্ছনার চিত্র রাজমালার বয়ানে প্রতিফলিত হয়।

বৃহত্তর বঙ্গসমাজে পুরুষের বহুবিবাহ ও সতীদাহ সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরার রাজ-পরিবারে রানিদের ভাগ্যেও এ দুটি অভিশাপের কালো ছায়া পড়েছিল। পুরুষের বহুবিবাহ নারী জীবনে অভিশাপ স্বরূপ। একজন পুরুষের কাছে নারীর মূল্য কম বলেই তিনি যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারতেন। পুরুষের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই বহুবিবাহের মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরার রাজারা প্রায় সকলেই একাধিক বিবাহ করেছেন। মহারাজা উদয় মাণিক্যের ২৪০ জন স্ত্রী ছিল বলে জানা যায়। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় বলেছেন- ***"বহুবিবাহের ফল ভাল না হইলেও কোন রাজাই তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, ইহাও একরকম পারিবারিক প্রথার মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল।...সে কালের রাজাগণ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন...।"***[৭]

মধ্যযুগে ত্রিপুরায় সতীদাহ প্রথার প্রকোপ অব্যাহত ছিল। রাজ-পরিবারের বহু মহিষী এই প্রথায় বলি হয়েছেন। রানিরাও পূণ্য অর্জনের আশায় নির্বোধের মতো এই বিধিলিপিকে মাতা পেতে মেনে নিয়েছিলেন। রানি অমরাবতীর সহগামী হওয়ার চিত্র উপস্থাপন করেছেন কবি-

রাম নাম লিখিলেখ শরীরের মাঝ।
চতুর্দ্দোলে বৈসে রাণী করি বহু সাজ।।
নৃপ সঙ্গে মহারাণী সহগামী চলে।
* * *
যথোচিত দান ধর্ম্ম রাণীয়ে করিয়া।
চিতা প্রবেশিতে যায় হরি নাম লৈয়া।।
প্রদক্ষিণ করি রাণী চিতা প্রবেশিল।
সেই কালে হরিধ্বনি লোকেতে করিল।।[৮] *(তৃতীয় লহর, পৃ, ৪৭-৪৮)*

সহমণের এরূপ চিত্র কাব্যের অন্যান্য লহরেও সহজ লভ্য। সাধারণ ঘরের নারীই হোন কিংবা রাজমহিষীই হোন, সকলকেই এই প্রথায় বলি হতে হয়েছে। কেননা প্রত্যেকেই যে নারী, জন্মসূত্রে সকলেই তো একই বিধিলিপির অংশীদার। সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন জানিয়েছেন- ***"প্রজাসাধারণের মধ্যেও সহমরণ প্রথার সমধিক প্রচলন ছিল।"*** (দ্বিতীয় লহর, মধ্যমণি ৯১) ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বন্ধ হওয়ার পরও ত্রিপুরায় সতীদাহ বন্ধ হয়নি। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য এ রাজ্যে সতীদাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আবার এ রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথাও প্রচলিত ছিল। অনেক ক্রীতদাসী দুর্বিসহ জীবনযাপন করতো। বীরচন্দ্র মাণিক্য ইংরেজ সরকারের সহায়তায় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথাও রদ করেছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য বহিঃশত্রুর দ্বারা বার বার আক্রান্ত হয়েছে। যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি ঘটনা তখন সময়ের গতির সঙ্গে অবিরাম ধারায় চলেছিল। যুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যরা অন্যান্য সামগ্রীর মতো নারীকেও লুঠ করে নিতো। এর মধ্য দিয়ে নারীর ভোগ্যা ও পণ্যা রূপটিই প্রকটিত হয়। যুদ্ধ পরবর্তী দুরবস্থার বর্ণনায় কবি তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক বাস্তব ছবি-

পুরুষ সকল যত প্রাণীকে বধিল।
থানাংছির গড়োপরে রক্ত নদী হৈল।।
নারী সব লুটিয়া লইল সর্ব্বজন।
দৈবগতি মাসেকের বালক লক্ষণ।।[১০] ***(দ্বিতীয় লহর, পৃ, ১৯)***

নারীর মানুষী সত্তার চাইতে তার রূপ যৌবন পুরুষের কাছে অধিক লোভনীয় হওয়ার ফলে সর্বত্রই তাকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখা হয়েছে। রাজাই হচ্ছেন তাঁর রাজ্য ও প্রজা-সাধারণের রক্ষক। কিন্তু দেখা গেছে অনেক রাজাই রক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উদয়মাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেই ব্যভিচার শুরু করেছিলেন, যার বর্ণনা দিয়েছেন কবি এভাবে-

দুই শ চল্লিশ নারী মহলে তাহার।
যোগ্যাযোগ্য তদন্তর না করে বিচার।।
গৃহস্থের কন্যা তাকে আনে বলাৎকারে।
ভুগিয়া অন্যেরে দেয় মনে ধরে যারে।।[১১] ***(দ্বিতীয় লহর, পৃ, ৬৮)***

উদয় মাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরা রাজ্যে নারীদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাড়ায়। তিনি অত্যাচারী শাসক, তাঁর সময়ে শাসন যন্ত্রের অবাধ সুযোগে রাজ-কর্মচারীরাও অত্যাচারে সামিল হয়। কেউ প্রতিবাদী হলে তাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হতো। কবির লেখনীতে সেই অবস্থার বাস্তব চিত্র নির্মিত হয়েছে-

অরিভীমের পুত্র গরুড়ধ্বজ ছিল।
সেই সব স্ত্রী সঙ্গে ব্যভিচার কৈল।।
সেই সব স্ত্রী রক্ষক যত সেনাগণ।
ভয়াতুর হৈয়া করে রাজায় নিবেদন।।
উদয়মাণিক্য রাজা অতি উগ্রমতি।
কর পদ নাশা কর্ণ কাটে শীঘ্রগতি।।[১২] ***(দ্বিতীয় লহর, পৃ, ৬৮)***

মহারাজা বিজয় মাণিক্যও তাঁর রাজত্বকালে নারীর প্রতি সুবিচার করেননি। রানিকে নির্বাসন দিয়ে তিনি পুনরায় বিবাহ করেছিলেন। সিংহাসনে বসার পর নারীর প্রতি তাঁর লোভ-লালসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রয়োজনে বলপূর্বক নারীকে তুলে এনে লালসা পরিতৃপ্তি করতেও তিনি দ্বিধান্বিত হননি। কবি লিখেছেন-

সুবর্ণ গ্রামেতে কত আছিল সুন্দরী।
বলেতে ধরিয়া আনে তাহারি যে পুরী।।
কুলীন চৌধুরী সবের সুন্দরী যার কন্যা।
সেই ঘরে নৃপতির পালঙ্ক রাখে ধন্যা।।[১৩] ***(তৃতীয় লহর, পৃ, ৫৬)***

এখানে রাজাকেই আমরা সরাসরি স্বৈরাচারী শোষকের ভূমিকায় পেয়ে যাই।

আবার রাজাদেরই অতি প্রশ্রয়ে রাজ-কর্মচারীরা নারীদের উপর অত্যাচার করার অবাধ ছাড়পত্র পেয়েছিল। রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি ও ধন বৃদ্ধিতেই রাজাদের ছিল অতি আগ্রহ। ফলত কর্মচারীরা প্রজাদের উপর এবং বিশেষ করে নারীর উপর কিভাবে অত্যাচার চালাতো, সে বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করার কোনো আগ্রহ তাঁদের ছিল না। তাই দেখা যায় সেনাপতি রায়কাচাগ নারীদের উপর অবাধ অত্যাচার চালায়, যাকে মনে হয় তাকেই ধরে আনে। কবি লিখেছেন-

বড়ুয়া সকের কন্যা মনোরম যত।
সম্ভোগ করয়ে সে যে নানাবিধ মত।।[১৪] ***(দ্বিতীয় লহর, পৃ, ২১)***

এখানে নারীর অবহেলিত ও অনাদৃত রূপটিই ফুঠে উঠেছে। নারীর কান্না, আর্তনাদ প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে পিষ্ঠ হয়েছে বারবার। রাজ-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রজারা অভিযোগ করলেও তার কোনো প্রতিকার রাজা করতেন না। ফলে তাদের ব্যভিচার আরও বেড়ে গিয়েছিল। ব্যভিচার করার এই অবাধ সুযোগ গ্রহণ করেই দুর্লভ নারায়ণের মত অসৎ প্রবৃত্তির লোক নারীদের উপর অবাধ অত্যাচার চালিয়ে নিশ্চিন্তে ভোগ বিলাসে দিন অতিবাহিত করতে পেরেছিল। তার অসৎ কাজে কেউ বাধা দেওয়ার ছিল না। তাই যেখানে যাকে পেয়েছে বিনা বাধায় তাকেই জোর করে এনে নিজের কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির কাজে লাগিয়েছে, যার প্রমাণ রয়েছে শ্রীরাজমালায়-

মাধবতলার হাটে এক যে সুন্দরী।
নানাবিধ শাক বেচে দরিদ্রের নারী।।
দোলাতে চড়িয়া যায় দুর্লভ নারায়ণ।
দেখিয়া ধরিয়া নিল সুন্দরী তখন।।[১৫] ***(দ্বিতীয় লহর, পৃ, ৪০)***

(চার)

ঐতিহাসিক কাব্য শ্রীরাজমালায় নারী জীবনের যে সার্বিক চিত্র প্রতিফিলিত হয়, তাতে দেখা যায় নারী জীবন এখানে মোটেই নিরাপত্তায় ছিল না। প্রত্যক্ষ দর্শীর বর্ণনা অনুসারে রচিত এই গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের বাস্তবসম্মত চিত্রই আমরা দেখতে পাই। ফলত বলা যায় যে, নারীর উপর অত্যাচার ও লাঞ্ছনার চিত্র পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই একরকম ছিল। সর্বত্রই তাকে ভোগ্যবস্তু কিংবা পণ্যবস্তু হিসেবে দেখা হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে। আর ত্রিপুরাও এর থেকে বাদ যায় নি। মধ্যযুগে ত্রিপুরা যতই স্বাধীন রাজ্য হোক না কেন, নারী জীবন এখানে মোটেই স্বাধীন ছিল না।

মধ্যযুগে লেখা বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখা থেকেই আমরা সমাজে পরিবারে নারীর একই অবস্থানের চিত্র পাই। তখনকার সময়ে নারীর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমাজ, পরিবার মেনে নিতো না। পুরুষের অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অবমাননা নিয়ে এক গরিমাহীন জীবন অতিবাহিত করতো সমগ্র নারী সমাজ। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরার রাজ-পরিবার ও সমাজে নারীর যে অবস্থান কাব্যে চিত্রিত, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজ-পরিবারে নারীর সামান্য মর্যাদা থাকলেও সমাজে নারীর আদৌ কোনো সম্মান ছিল না, ছিল না উপযুক্ত নিরাপত্তা। **History of Women's Suffrage** গ্রন্থে একজন মেয়ের স্থান চিহ্নিত হয়েছে এভাবে-***"She was not a person, not recognised as a citizen, was little better than a domestic servant."*** [১৬] আলোচ্য শ্রীরাজমালা গ্রন্থেও অনুরূপভাবে অতি সামান্য ও তুচ্ছভাবে নারীকে উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু শারীরিক অস্তিত্ব ছাড়া নারীর সমগ্র মানুষী সত্ত্বা এখানে অস্বীকৃত।

সূত্রনির্দেশঃ

---

১) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, পৃ-১৪৪
২) শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক), শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, মধ্যমণি পৃ-৭৭
৩) ঐ, দ্বিতীয় লহর, মধ্যমণি পৃ-৮২
৪) ঐ, প্রথম লহর, পৃ-৪২
৫) ঐ, তৃতীয় লহর, পৃ-৩
৬) ঐ, প্রথম লহর, পৃ-৪৭
৭) ঐ, তৃতীয় লহর, মধ্যমণি, পৃ-১৫৬
৮) ঐ, তৃতীয় লহর, পৃ-৪৭-৪৮
৯) ঐ, দ্বিতীয় লহর, মধ্যমণি, পৃ-৯১
১০) ঐ, দ্বিতীয় লহর, পৃ-১৯
১১) ঐ, দ্বিতীয় লহর, পৃ-৬৮
১২) ঐ, দ্বিতীয় লহর, পৃ-৬৮
১৩) ঐ, তৃতীয় লহর, পৃ-৫৬
১৪) ঐ, দ্বিতীয় লহর, পৃ-২১
১৫) ঐ, দ্বিতীয় লহর, পৃ-৪০
১৬) অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে 'নারীর মূল্য' দ্র. অরুণ ঘোষ, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা(পঞ্চদশ সংকলন) বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০০৮, পৃ-৮৮।

গ্রন্থঋণঃ

আকর গ্রন্থঃ

১) সেন বিদ্যাভূষণ কালীপ্রসন্ন (সম্পাদক): শ্রীরাজমালা (ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত), (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ লহর) উপজাতি সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, আগরতলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৩
২) সিংহ কৈলাসচন্দ্র, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, দ্বিতীয় অক্ষর সংস্করণ, ১৪০৫

সহায়ক গ্রন্থ

১) চট্টোপাধ্যায় জয়ন্তী, নবেন্দু সেন (সম্পাদক), অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য পুনর্পাঠ ও পুনর্বিবেচনা, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬
২) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় মার্জিত সংস্করণ, ২০০১
৩) বেবেল আগস্ট, নারী: অতীত-বর্তমান ভবিষ্যতে, কনক মুখোপাধ্যায় (অনুবাদক) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৩
৪) বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাথ, রাজসভার কবি ও কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংশোধিত সংস্করণ, ২০০১
৫) ভট্টাচার্য স্বপ্না, রাজমালায় নারী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, মানবী প্রকাশনী, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯

৬) লালা আদিত্য কুমার, মনসামঙ্গল কাব্য, জীবন দৃষ্টির বিচিত্র দর্পণে, কল্যাণী পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০
৭) সেন প্রবোধচন্দ্র, বাংলার ইতিহাস সাধনা, ভবতোষ দত্ত (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯২

*****